ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

অধ্যাপক গোলাম আযম

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৫৫

৯ম প্রকাশ (আধু. ৬ষ্ঠ প্রকাশ)
রবিউল আউয়াল ১৪৩২
ফাল্গুন ১৪১৭
ফেব্রুয়ারী ২০১১

বিনিময় ঃ ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

DHARMONEROPAKHYA MOTOBAD by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 15.00 Only.

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের জন্মকথা

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ইংরেজী 'সেকিউলারিজম' শব্দেরই বাংলা অনুবাদ। গত আড়াই শত বছর থেকে এটা দুনিয়ার সর্বত্র একটি আদর্শের মর্যাদা লাভ করেছে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কামাল পাশাই তুরস্কে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বে মুসলমানগণ এরূপ নির্লজ্জভাবে দুনিয়াময় প্রচার করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছে বলে কোন নযীর পাওয়া যায় না। এমনকি যে পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে কায়েম হয়েছিল সেখানেও এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী প্রভাবশালী লোক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশ্য সমর্থক। পাকিস্তানের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই কলংকময় ইতিহাস। তাই এ মতবাদের জন্ম বৃত্তান্ত, প্রকৃত রূপ ও পরিণাম সম্পর্কে তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়

ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসাবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের বিধান মেনে চলার বিরুদ্ধে এর কোন বিশেষ আপত্তি নেই বলে এ মহান 'উদারতার' স্বীকৃতি স্বরূপ এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা রাখা হয়েছে।

এ মতবাদ সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে এর নিজস্ব ধারণা আছে। আল্লাহ নিজের প্রতি যত গুণই আরোপ করুন না কেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মাত্র কয়েকটা গুণই স্বীকার করতে রাযী। তাদের মতে আল্লাহ এ বিশ্বটা শুধু সৃষ্টি করেছেন, বড়জোর তিনি এ জড়জগতের নিয়ম-কানুন (প্রাকৃতিক নিয়ম) রচয়িতা। মানুষকেও না হয় তিনিই পয়দা করেছেন। তাঁকে পূজা অর্চনা করলে মৃত্যুর পর তা কোন কাজে লাগলেও লাগতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে উন্নতি, শান্তি ও প্রগতির জন্য আল্লাহ বা রাসূলের কোন প্রয়োজন নেই। এটাই আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা গোটা সমাজ জীবনকেই আল্লাহ এবং ধর্মের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখাকে আদর্শ বলে মনে করে। তাদের মতে ধর্ম নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। দু' বা ততোধিক মানুষের সকল প্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মকে অনধিকার প্রবেশ করতে দেয়া চলে না। কেননা সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ প্রগতি বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস

যদিও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কোন আধুনিক সৃষ্টি নয়, তবুও একটি আদর্শ হিসাবে বর্তমানকালে এর প্রচার চলছে। একটি মতাদর্শ হিসাবে আধুনিক ও প্রগতিশীল বলেই এক শ্রেণীর নিকট এর সুনাম। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এ আধুনিক সংস্করণ প্রায় আড়াই শত বছর পূর্বে ইউরোপে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পনর শতাব্দীতে এর জন্ম হয় এবং আড়াই শত বছর সংগ্রামের পর আঠার শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা বিজয়ী মতাদর্শ হিসাবে কায়েম হয়।

তৎকালীন ইউরোপের অবস্থা

যে ইউরোপ এর জন্মস্থান, সেখানকার তৎকালীন অবস্থার সঠিক ধারণা ব্যতীত ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস বুঝা অসম্ভব। পনর শতাব্দীতে ইউরোপে সবেমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে। সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের হাতে নেতৃত্ব ছিল। আজকাল যেমন উচ্চ জ্ঞান লাভ করার জন্য আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট ধর্ণা দেই, চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপবাসীদেরকেও তেমনি আলহামরা, কর্ডোভা ও গ্রানাডায় জ্ঞানের তালাশে ভীড় জমাতে হতো।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতা খৃস্টপূর্ব যুগে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় মুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বিভাগই মুসলিম সভ্যতার সৃষ্টি। পনর শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারেই ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের নিকট তাদের প্রথম হাতে খড়ি হয়। কিন্তু বারো শতাব্দীর পর থেকে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পূর্বপুরুষের সাধনা লব্ধ জ্ঞান সম্পদের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন গতানুগতিক ধারায় চলতে থাকে। অপর দিকে ইউরোপ যেটুকু জ্ঞানের আলো মুসলমানদের নিকট থেকে লাভ করেছিল তার ভিত্তিতে নতুন জ্ঞান সাধনায় তারা ক্রমেই অগ্রসর হতে লাগল।

সে সময় ইউরোপে খৃস্টান পাদ্রীদের শাসন ছিল। পাদ্রীরা ধর্মের নামে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজত্ব করছিল। অথচ তাদের নিকট আল্লাহর বিশুদ্ধ বাণীর অস্তিত্ব নেই বলে ষষ্ঠ শতাব্দীতেই কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। পাদ্রীরা আল্লাহর নামে নিজেদের মত চালু করত। তারা মানুষের নিকট ধর্মের নামে নিরংকুশ আনুগত্য দাবী করত এবং শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকায় তারা গায়ের জোরেই আনুগত্য করাত। জীবনের প্রত্যেক দিকে প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে তারা সকল বিষয়েই নিজেদের মতামত জোর করে চাপিয়ে দিত।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের লড়াই

ইউরোপে যখন নতুন জ্ঞান সাধনার উন্মেষ হল তখন পাদ্রীদের মনগড়া গবেষণাহীন মতামত গবেষকদের নিকট ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। সৃষ্টিজগতের রহস্য যতই উৎঘাটিত হতে লাগল, পাদ্রীদের সাথে জ্ঞান সাধকদের মতবৈষম্য ততই প্রকট হয়ে উঠল। বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকটি নতুন মত ক্ষমতাসীন পাদ্রীদের ভ্রান্তি প্রমাণ করে চলল। পাদ্রীগণ তখন অনন্যোপায় হয়ে ধর্মের দোহাই পাড়তে শুরু করল এবং শাসন শক্তি প্রয়োগ করে বেত্রাঘাত থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত অমানুষিক শাস্তি দ্বারা গবেষকদের শায়েস্তা করতে লাগল। গ্যালিলিওর ন্যায় শত শত জ্ঞান পিপাসী পাদ্রীদের এ খোদায়ী অস্বীকার করার পাপে চরম দণ্ড ভোগ করল।

এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হল। চিন্তা ও গবেষণা ভিত্তিক জ্ঞানের অনুসন্ধানীদের উপর এ যুলুমের বিরুদ্ধে সুধীমণ্ডলী ও চিন্তাশীলদের মধ্যে বিদ্রোহ দানাবেঁধে উঠল। পাদ্রীদের নিজস্ব মনগড়া মতামতের ভ্রান্তি যতই প্রমাণিত হল ততই এ বিদ্রোহী শক্তি অধিকতর মযবুত হয়ে চলল। ধর্মের নামে পাদ্রীদের এ অধার্মিক আচরণ বিদ্রোহীদের মনে তীব্র ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি করল। তারা ধর্মকে মানুষের পক্ষে সকল প্রকার মংগলের বিরোধী বলে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসল।

গীর্জা বনাম রাষ্ট্র

বিদ্রোহীরা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করল। পাদ্রীরা (গীর্জা) ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধ জনতার সহায়তায় রাজশক্তি নিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। অন্যদিকে জীবনের সকল বিভাগ থেকে পাদ্রীদের উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিদ্রোহীরা অগ্রসর হল। দীর্ঘ দু'শ বছর (ষোল ও সতর শতাব্দী) ধরে এই ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। এ সংগ্রাম ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের' লড়াই নামে পরিচিত।

দীর্ঘ দু'শ বছরের অবিরাম সংগ্রামের দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, ধর্মবিশ্বাসকে গায়ের জোরে ধ্বংস করা যায় না। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তাদের মনে যেমন জোর করে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি বিশ্বাসীদেরকেও শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অবিশ্বাসীতে পরিণত করা যায় না। দু' পক্ষই বিব্রত হয়ে পড়ল। অতপর সংস্কারবাদীদের নেতৃত্বে দু' পক্ষের মধ্যে আপোষ প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে উঠে।

আপোষ প্রস্তাব

মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলন 'আপোষ আন্দোলন' নামে খ্যাত। এ আন্দোলনের প্রস্তাব হল যে, "ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক এবং মানুষের ধর্মীয় দিকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চার্চের হাতে থাকুক। কিন্তু সমাজের পার্থিব জীবনের সকল দিকের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং পার্থিব কোন বিষয়েই চার্চের কোন প্রাধান্য থাকবে না। অবশ্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে চার্চের নিকটই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবার সময় শপথ গ্রহণ করতে হবে।"

সকল দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাব উভয় পক্ষই গ্রহণ করতে রাযী হল। পাদ্রীরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমর্থন ছাড়া শুধু ধর্মান্ধ জনতার সাহায্যে যে নেতৃত্ব চলে না তাও তারা বুঝতে পারল। বিশেষতঃ দু'শ বছর সংগ্রাম পরিচালনার পর তারা জয়ের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করল। বিশেষ করে রাষ্ট্র পরিচালকদের চার্চে শপথ গ্রহণ করার প্রস্তাবে পাদ্রীদের কিছুটা ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বলে তারা সসম্মানে ক্ষমতাচ্যুত হতে রাযী হল। অপর দিকে বিদ্রোহীরা যদিও ধর্মকে উৎখাত করার ব্রত নিয়েই জয়ের পথে এগিয়ে চলছিল তবুও তারা এ চিন্তা করেই এ আপোষে সম্মত হল যে, পার্থিব জীবনের কোন ক্ষেত্রেই যদি ধর্ম ও গীর্জা কোন প্রাধান্য না পায় তাহলে বিষদাঁতহীন এ সাপকে ভয় করার কোন কারণ নেই। তাই তারা চার্চকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত হল। রাষ্ট্র পরিচালকদের চার্চের নিকট শপথ গ্রহণ করায়ও ধর্মদ্রোহীদের আপত্তি হল না। ক্ষমতাচ্যুত পাদ্রীদের এ অসহায় অবস্থায় এটুকু অপার্থিব এবং মূল্যহীন ঘুষ দিতে তারা কার্পণ্য করল না।

চিন্তার বিষয়

এভাবে সমাজ জীবন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করার 'মহতী পরিকল্পনা' দীর্ঘ সংগ্রামের পর পরম সাফল্য অর্জন করল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই সাফল্যজনক আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

এক ঃ যে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের সূচনা হয়, সেখানে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই খৃস্টান ধর্মযাজকদের প্রাধান্য ছিল। ইসলামের শিক্ষা সেখানে প্রবেশ লাভ করেনি। পার্থিব প্রয়োজনে বস্তুগত ও জড় জীবন সম্পর্কে ইউরোপ মুসলমানদের নিকট থেকে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেছিল—একথা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু তারা ইসলামের শিক্ষা বা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মোটেই গ্রহণ করেনি। সে যুগ ছিল মুসলমানদের পতনের যুগ। সে পতনের কারণ, তারা ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা হিসাবে দুনিয়ায় কায়েম রাখার দায়িত্ব পালন করেনি। যদিও সেকালের মুসলমানদের ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকে উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট ছিল তবুও তা এমন একটা সজীব ও আকর্ষণীয় শক্তি হিসাবে অবশিষ্ট ছিল না যে, ইউরোপবাসীকে তা আকৃষ্ট করতে পারে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা যদি তাদের ইউরোপীয় শাগরিদদের নিকট ইসলামকে একটি সুষ্ঠু জীবন বিধান হিসাবে পেশ করতেন তাহলে ইউরোপের নব জাগরণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারত। এতে খৃস্টান পাদ্রীদের মনগড়া ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ইসলামী জীবনব্যবস্থারই রূপায়ণ হয়তো অসম্ভব ছিল না।

দুই ঃ খৃস্টান পাদ্রীদের নিকট আল্লাহর বিধান ছিল না। তারা ধর্মের নামে যা প্রচার করত তা আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ছিল না। তারা গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর নিজেদের ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে তাদের মতবাদের সূত্রসমূহ যখন ভ্রান্ত ও সন্দেহজনক বলে প্রমাণিত হতে শুরু করল তখন মূল ধর্মই অস্বীকৃত হল বলে তারা মনে করে বসল।

সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা নতুন শিক্ষা ও আন্দোলনের বিরোধিতা করতে লাগল এবং এ ব্যাপারে তারা যুক্তি ত্যাগ করে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করল। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের এ সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না, পাদ্রীদের বিরুদ্ধেই বিজ্ঞানের বিদ্রোহ ছিল। কিন্তু নতুন জ্ঞান সাধকেরা সঠিক ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল বলে তারা ধর্মের বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করে বসল। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, এতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়নি।

তিন ঃ এ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞান যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে যত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার কোনটাই আল্লাহ ও রাসূলের কোন সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেনি। যে কয়টি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইসলামের নীতি বিরোধী বলে মনে হচ্ছে তা এখনও থিওরীর পর্যায়েই রয়েছে। বাস্তব তথ্য দ্বারা অকাট্যরূপে কোনটাই প্রমাণিত হয়নি।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

উপরোক্ত তিনটি মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করার সাধ্য কারোর নেই। তবুও মুসলিম দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার কেমন করে হল ? আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মুসলিম সর্বত্র ইসলামকেও পাদ্রীদের ধর্মের ন্যায় উন্নতি ও প্রগতি বিরোধী মনে করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ মুসিলম বিশ্বে যারা জ্ঞান চর্চা করেছেন তাদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক অমুসলিম চিন্তানায়কের চেয়েও কম জানেন। তারা অনেক মোটা মোটা বই মুখস্থ করেছেন কিন্তু কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি—হয়তো বা প্রয়োজনও বোধ করেননি। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন ও হাদীসের গবেষণা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন না করার ফলে এবং পার্থিব জীবনকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে বিচার করার সুযোগের অভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে যোগ্য নেতৃত্ব দান করতে অক্ষম। দীর্ঘকাল অনৈসলামী শাসনের ফলে ইসলামী মন-মগজ ও চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্ব জীবনের সকল দিক থেকেই উৎখাত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অথচ ইসলামী মন মস্তিষ্ক শূন্য মুসলমানদের নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এ নেতৃত্বের পক্ষে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা এবং যে কোন পন্থায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া মোটেই বিস্ময়কর নয়।

দুই ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান ও চিন্তা গবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এ বিরাট গাড়ীখানাকে টেনে নিয়ে চলছে। চিন্তানায়ক সাধকরাই উক্ত ইঞ্জিনের পরিচালক। তাদের মর্যি অনুযায়ী গোটা গাড়ীর সকল যাত্রীকেই চলতে হয়। যদ্দিন মুসলমান জাতি চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তদ্দিন ইসলামী চিন্তাধারাই মানব জাতিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর, ভাল ও মন্দের ইসলামী মাপকাঠিই তখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে বর্তমান খোদাহীন চিন্তাধারার বন্যার মুখে ইসলামী জ্ঞান বঞ্চিত মুসলিমদের ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে আধুনিক জ্ঞান সাধনার যে ইঞ্জিন দুর্বার গতিতে মানবজাতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে মুসলিম নামধারীদের এমনকি ধার্মিক বলে পরিচিত বহু মুসলমানেরও প্রভাবান্বিত হওয়া বিস্ময়কর নয়।

চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ দাসত্ব মুসলিম নেতৃত্বকে পঙ্গু করে রেখেছে। তারা ইউরোপের উস্তাদদের নিকট নৈতিক ও মানসিক আত্ম বিক্রয়ের মাধ্যমে বিশ্বস্ত শাগরিদের ন্যায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করে চলেছেন। তাদের স্বাধীন মন-মগজ বা চক্ষু আছে বলে মনে হয় না। তারা পাশ্চাত্যের চক্ষু দ্বারা সুন্দর অসুন্দরের সিদ্ধান্ত নেন ; ইউরোপের মগজ দিয়ে উন্নতি অবনতির হিসাব করেন এবং উস্তাদদের মন দিয়েই ভালমন্দের বিচার করেন।

ইউরোপের এসব মানস সন্তানগণ যদি মানসিক দাসত্ব ত্যাগ না করেন তাহলে একদিন রাজনৈতিক দাসত্বই এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর উপর নেমে আসবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো আজ এ কারণেই বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামে পরিণত হতে চলেছে।

❐

যুক্তির মানদণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইতিহাস পাঠ করে কারো এ ধারণা করা উচিত নয় যে, পনর শতাব্দীর পূর্বে কোন কালেই এ মতবাদ দুনিয়ায় প্রচলিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাংগ ধর্মের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের লড়াই চিরন্তন। যখনই আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাংগ জীবনবিধান মানব সমাজে কায়েম করার উদ্দেশ্যে নবী ও রাসূলগণ আওয়াজ তুলেছেন তখনই শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে নানা অজুহাতে প্রবল বিরোধিতা হয়েছে। ইবরাহীম আ.-এর সময় নমরূদ ও মূসা আ.-এর সময় ফিরআউন কঠোরভাবে পূর্ণাংগ ধর্মের বিরোধিতা করেছে। অথচ তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করত। ধর্মকে কোন সময়ই তারা অস্বীকার করেনি। নমরুদের দরবারে রাজ পুরোহিত ছিল ইবরাহীম আ.-এরই পিতা আযর। আল্লাহকে ও ধর্মকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিচালক শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে তারা কিছুতেই রাজী ছিল না। সুতরাং আধুনিক পরিভাষায় তাদেরকেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীই বলতে হবে। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগে আবু লাহাব এবং আবু জেহেলও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীই ছিল।

যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের মতবাদকে কোন দিক দিয়েই মযবুত যুক্তি দ্বারা দুর্ভেদ্য করে তুলতে পারেনি। দলিল প্রমাণের পরিবর্তে তারা সর্বদাই অন্ধ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। শাসন ও অর্থশক্তি প্রয়োগ করেই তারা গায়ের জোরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কায়েম রাখতে চেষ্টা করে। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ন্যায় অবৈজ্ঞানিক মতবাদ আর কিছুই নেই বলে মনে হয়। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাই সবচেয়ে বেশী বুদ্ধি ও জ্ঞানের দোহাই পাড়েন। তাই যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন ঃ

এক ঃ এ বিশ্বের যদি কোন স্রষ্টা থাকেন এবং সমগ্র বস্তুজগতে যদি তার দেয়া প্রাকৃতিক বিধানসমূহ কার্যকর বলে স্বীকৃত হয় তাহলে সেই মহাশক্তিশালী স্রষ্টাকে মানুষের জীবনে একটি কার্যকর শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি করার কি কারণ থাকতে পারে ? প্রাকৃতিক জগতে কোন ক্ষুদ্রতম বিধানকে বদলীয়ে দেবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এমনকি মানুষ তার আপন শারীরিক বিধিও ইচ্ছামত পরিবর্তন করে সুস্থ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় মানব জীবনে সামঞ্জস্য ও শৃংখলা বিধানের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা বিশ্ব স্রষ্টার

নিকট থেকে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তকে কিরূপে যুক্তিভিত্তিক বলে মেনে নেয়া যায় ? যিনি জীব জগত, উদ্ভিত জগত ও সৌরমণ্ডলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিধান দিয়েছেন তাঁকে মানব জাতির জন্য বিধানদাতা হিসাবে স্বীকার করায় আপত্তি কেন ?

প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এখানে মুনাফেকীর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। 'আল্লাহ্ নেই' বলে ঘোষণা করবার দুঃসাহস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মনে করেই তারা ধূর্ততার বক্রপথ অবলম্বন করে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার (Constitutional head) ন্যায় প্রভাবহীন এক দুর্বল সত্তা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করে তারা স্রষ্টায় বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দেবার অপরূপ কৌশল ফেঁদেছে। এ পন্থায় বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে তুষ্ট এক শ্রেণীর ভীরু লোক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে স্বীকার করেও আল্লাহকে খুশী করা যায় বলে বিশ্বাস করে। আর শাসন শক্তির ধারক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এ ভীরু ধার্মিকদের সমর্থনেই টিকে থাকার চেষ্টা করে। এ সমর্থনটুকুর জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসকরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করলেও মুখে স্বীকার করে থাকে।

দুই : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আল্লাহকে ব্যক্তিগত জীবনে আনুগত্যের অধিকারী বলে স্বীকার করে এবং সমাজ জীবনে আল্লাহ্ ও ধর্মকে মান্যার প্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা করে। এখানে প্রশ্ন হল, কোন্ দলিলের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত এলাকায় সীমাবদ্ধ করেন ? আল্লাহ্ কি কোথাও এ বিষয় কোন ইংগিত দিয়েছেন ? ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু পূজা পার্বন ও নামায রোযার অনুষ্ঠান পালন করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী যার যেরূপ খুশী জীবন যাপন করলেও আল্লাহর কোন আপত্তি নেই বলে কোন নবীর নিকট ওহী নাযিল হয়েছে কি ? আল্লাহ্ যদি নিজে তাঁর আনুগত্যের দাবীকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করে না থাকেন তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদীদের নির্দেশেই কি আল্লাহকে সমাজ জীবনে অমান্য করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ?

আল্লাহ যদি মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের জন্য কোন বিধান না-ই দিয়ে থাকেন তাহলে এমন শক্তিকে ব্যক্তিগত জীবনেই পূজা করার প্রয়োজন কি ? মানুষের জীবনে চলার পথের সঠিক সন্ধান যিনি দিতে পারেন না তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার প্রেরণা কিরূপে জাগবে ? সমস্যা সংকুল পার্থিব জীবনে যিনি আমাদের শান্তির পথ দেখান না তিনি পরকালে শান্তি দেবেন বলে ভরসা করা একেবারেই

অর্থহীন। তিনি সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করার পর এর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম নন বলে মনে করার কারণ কি ? গোটা সৃষ্টিজগত কঠোর নিয়মের রাজত্ব মেনে চলছে। এ নিয়মাবলী যিনি সৃষ্টি করেছেন তার আনুগত্যকে মন্দির, গীর্জা ও মসজিদে সীমাবদ্ধ করে রাখবার ধৃষ্টতা কেন ? মানব জীবনে তাঁকে সক্রিয় শক্তি হিসাবে স্বীকার না করার কোন যুক্তি থাকতে পারে কি ?

তিন ঃ যিনি এ বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, দৃশ্য, অদৃশ্য যাবতীয় সৃষ্টি পরিচালনা করছেন জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন বিষয়ে তাঁর ত্রুটি থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। মহাজ্ঞানী 'হাকীম' ও আলীম না হলে তার পক্ষে অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ খচিত শূন্য মণ্ডলে শৃংখলা রক্ষা করা অসম্ভব হতো। মানুষের জটিল শরীর বিজ্ঞানের যাবতীয় নিয়ম-কানুন যিনি তৈরী করেছেন, একমাত্র তিনিই মানব জীবনে শান্তিস্থাপনের পথনির্দেশ করতে সক্ষম। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমন আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান তালাশ করতে হয় তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সঠিক ব্যবস্থার জন্যও তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আল্লাহ্ আছেন অথচ সর্বজ্ঞ নন বা সর্বাবস্থায় নেই—একথার চেয়ে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে ? হয় আল্লাহ নেই, আর না হয় সর্বত্রই আছেন। তিনি মন্দির ও মসজিদে আছেন, আর আদালত ও ফৌজদারীতে, আইন সভায়, রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অস্তিত্ব নেই—একথা একমাত্র নির্বোধেরাই মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহকে স্বীকার করলে তাঁকে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আইনদাতা হিসাবে মানতে হবে।

চার ঃ ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় বিধান মেনে চলা এবং সমাজ জীবনকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার মতবাদ অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক। যারা এ মতবাদের প্রচারক তারা ব্যক্তি জীবনেও ধর্মের বন্ধন স্বীকার করতে রাজী হয় না। "ধর্ম যদি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই স্বীকারই কর তাহলে তোমরা ব্যক্তি জীবনেও ধর্মকে মেনে চলো না কেন ?" ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীকে এ প্রশ্ন করা হলে উদারনীতির দোহাই দিয়ে বলে যে, এ প্রশ্ন করাটাও সামাজিক ব্যাপার। আপনি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মকে কতটা মেনে চলেন তা যেমন জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই, আপনিও আমার ব্যক্তি জীবন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এভাবে অত্যন্ত কৌশলের সাথে ধর্মকে অস্বীকার করার ফন্দি হিসাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার এ আযব মতবাদ প্রচার করা হয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ধর্ম বিরোধিতায় মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই।

পাঁচ ঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মধ্যে যে ব্যবধানের উল্লেখ করেন তা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চরম অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিজ্ঞান বিরোধী মতবাদ পোষণ করে থাকেন। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মাঝখানে ব্যবধানের সীমারেখাটি কোথায়? সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের ব্যক্তি জীবন সমাজ থেকে কী প্রকারে পৃথক হতে পারে? ধর্মীয় কারণে যে ব্যক্তি সত্যবাদী সে তার সত্যবাদিতা সমাজ জীবনেই প্রয়োগ করবে। কিন্তু অপর ব্যক্তির সাথে সামাজিক জীবনযাপনের বেলায় মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত হলে ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী হওয়ার উপায় কি? ব্যক্তি জীবনে চরিত্রবান ও চরিত্রহীন হওয়ার কোন উপায় নেই। কেউ ব্যক্তি জীবনে গুণ্ডা হয়েও রাজনৈতিক জীবনে সৎ হতে পারবে কি? সমাজ জীবনে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক বলে স্বীকৃত হতে পারে কি? প্রত্যেকটি মানুষই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। তার জীবনে এমন কোন ব্যাপারই থাকতে পারে না যা অন্য কোন মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। নির্জনে বসে এক ব্যক্তি যা চিন্তা করে সেখানেও সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয় না। সে যে কোন কাজই করুক তার কোন না কোন সামাজিক পরিণাম নিশ্চয়ই দেখা দেবে।

মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের নামই সমাজ। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে যারা রাজী তারা পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায় ধর্মকে কিরূপে অস্বীকার করবে? আর যদি অস্বীকারই করে তাহলে ধর্মকে স্বীকার করা হল কোথায়? ব্যক্তিগণ পৃথক পৃথকভাবে ধর্মকে মেনে চলবে, কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায় আর ধর্মের প্রভাব স্বীকার করবে না—একথা কী প্রকারে যুক্তিসম্মত বলে গ্রহণ করা যায়?

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সকল দিক দিয়েই যুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহকে জীবনের কোন ক্ষেত্রে দখল দেয়া বা কোন কোন বিভাগে বেদখল করার কারো ইখতিয়ার নেই। ধর্মস্থানের বাইরে মানব জীবনের বিশাল ময়দানে আল্লাহর উপর ১৪৪ ধারা জারী করার এ অপচেষ্টা জীবন সম্পর্কে ভোগবাদী দৃষ্টিভংগীরই সৃষ্টি।

ধর্ম মানুষকে যেসব নৈতিকতার বন্ধন মেনে চলবার নির্দেশ দেয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ভোগ বিলাসীদের পক্ষে তা পালন করা সম্ভব নয় বলেই তারা এ চোরা পথ সন্ধান করে নিয়েছে। জীবনকে নৈতিকতার ঝামেলা থেকে মুক্ত করে আযাদ জীবন যাপনের সস্তা সুবিধাটুকু উপভোগ করতে হলে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায়ই নেই। সুতরাং এ মতবাদ যে মানুষের সদিচ্ছার সৃষ্টি নয়, তা বলাই বাহুল্য।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণাম

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এটা কোন ইতিবাচক (Positive) মতাদর্শ নয়, এটা নিতান্তই একটি নেতিবাচক (Negative) দৃষ্টিভংগী মাত্র। ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করার নামে মানব জীবনকে ধর্ম ও আল্লাহর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার এ মতবাদকে প্রকৃতপক্ষে আদর্শহীনতাই বলা উচিত। মানুষকে ধর্মের বন্ধন ও স্রষ্টার দাসত্ব থেকে আযাদ করার পর নির্দিষ্ট আর্দশের পথে পরিচালনার ইংগিত এ মতবাদে পাওয়া যায় না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব মেনে চলার আদর্শ থেকে বিচ্যুত এ মতবাদ মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় নিক্ষেপ করে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ স্বয়ং কোন আদর্শ নয়, বরং এটা চরম আদর্শহীনতা (Absence of Ideology) ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক ঃ আদর্শিক পরিণাম

মানুষ এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব যে, তাকে সকল বিষয়েই নিজের ভাল-মন্দ বাছাই করার ঝামেলা পোহাতে হয়। অন্যসব জীবের ন্যায় তার পরিপূর্ণ বিকাশ আপনা আপনিই হতে পারে না। সুতরাং আদর্শের সন্ধান করা ছাড়া মানুষের কোন উপায় নেই। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন করে অনিশ্চিত পথে ছেড়ে দেয় তখন তার জীবনে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার পক্ষে আদর্শ শূন্য অবস্থায় জীবনযাপন করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। ফলে এ শূন্যতাকে পূরণ করার জন্য তার সামনে অনেক বিচিত্র ও বিপরীতমুখী আদর্শের আবির্ভাব ঘটে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও অন্যান্য দিকে মানুষ তখন আদর্শের সন্ধান করতে বাধ্য হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে যখন মানুষ আদর্শ তালাশ করতে থাকে, তখন বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষ পৃথক পৃথকভাবে বিচিত্র রকমের আদর্শ আবিষ্কার করে। একই মানুষের পক্ষে মানব জীবনের সর্বদিক ও বিভাগের উপযোগী সামঞ্জস্যশীল পূর্ণাংগ আদর্শ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না বলে বাধ্য হয়েই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন মানুষের রচিত আদর্শ গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থায় সামঞ্জস্যময় জীবন কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। এ আদর্শিক অসামঞ্জস্য ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বপ্রধান বিষময় পরিণাম।

দুই ঃ নৈতিক পরিণাম

মানুষ নৈতিক জীব। নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে উন্নত মর্যাদার অধিকারী করেছে। আইন ও শাসন মানুষের মধ্যে প্রকাশ্য

নৈতিকতা কিছুটা সৃষ্টি করলেও অন্তরে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি না হলে মানুষের ব্যক্তি জীবনে নৈতিকতা মযবুত হতে পারে না। এ নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য এমন এক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যিনি সর্বাবস্থায় মানুষের চিন্তা ও কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং যিনি আদালতে আখিরাতে ন্যায় বিচার করে মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। আইন মানুষের কর্মজীবনকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। একমাত্র ধর্মই মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির উপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। তাই ধর্মই কর্মজীবনকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। নৈতিক চরিত্র বর্জিত মানুষকে মানবদেহী পশুই বলা যায়। বরং বুদ্ধি শক্তির অধিকারী মানুষ চরিত্রহীন হলে পশুর চেয়েও অধিক অনিষ্টকারী হতে পারে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষকে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করতে পারে। এ মতবাদ মানবদেহের সুপ্ত পশুত্বকে লাগামহীন করে নৈতিকতার বন্ধনকে ছিন্ন করারই পাশব আদর্শ মাত্র।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে সভ্যতার জন্ম দিয়েছে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তা মনুষ্যত্বের উপযোগী হতে পারে না। মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করার একমাত্র অবলম্বনই ধর্মবোধ। মানুষ তার পশু প্রবৃত্তির তাড়নায় ধর্মকেও কুপ্রবৃত্তির সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে মানুষের যে সহজাত ধারণা রয়েছে তা একমাত্র ধর্মেরই অবদান। নৈতিক বিধান একমাত্র ধর্মেরই অনুশাসন। মানুষের জীবনে নৈতিক অনুশাসন কার্যকর করতে হলে সমাজ জীবনকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত নয়।

তিন ঃ মূল্যমানের পরিণাম

মূল্যবোধই মানুষের জীবনকে সত্য ও কৃষ্টিসম্মত করে তোলে। সভ্য ও অসভ্য, ভাল ও মন্দ, সঠিক ও বেঠিক, সুন্দর ও কুৎসিত ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছবার দায়িত্ব যদি প্রত্যেক মানুষের যুক্তির উপর ন্যস্ত থাকে, তাহলে বিশ্বের মানুষ কোন চিরন্তন ও শাশ্বত মূল্যমানের সন্ধান পাবে না। একমাত্র মানবজাতির স্রষ্টার পক্ষেই চিরন্তন মূল্যমান (Eternal Values) নির্দ্ধারিত করা সম্ভব। একই সঙ্গে দু'টো বিপরীত জিনিস সত্য হতে পারে না। অথচ মানুষ নিজের বুদ্ধি সর্বস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে পরস্পর বিপরীত মূল্যমান নির্ধারণ করে। মদ্যপান হয় ভাল না হয় মন্দ। অথচ কতক লোক ভাল মনে করে, আবার অনেক লোক এটাকে মন্দ মনে করে। প্রত্যেক বস্তু ও কার্যের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর না করলে মানুষ নিজের বুদ্ধি দ্বারা সঠিক মূল্যমান নিরূপণ করতে পারবে না। ফলে এক সময় যা ঠিক বলে সিদ্ধান্ত করবে অন্য সময় আবার বেঠিক বলে তা বর্জন করবে। অথচ তা একবার ঠিক ও পরে বেঠিক হতে পারে না।

আমেরিকার আইন সভায় ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে শাসনতন্ত্রের ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে মদ অবৈধ ঘোষণা করে আইন পাশ করা হয়। কিন্তু আবার ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শাসনতন্ত্রের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইন বাতিল করে মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। উভয় সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যই জাতির মংগল বিধান। কিন্তু এ দু-বিপরীত সিদ্ধান্তের বেলায়ই মদের মূল্যমান কিন্তু একই ছিল। সুতরাং মানুষ মূল্যমান নিরূপণে ভুল করতে পারে। মূল্যমান কোন সময়ই পরিবর্তিত হয় না। ধর্মকে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ত্যাগ করার ব্যবস্থা করলে এ চিরন্তন মূল্যমান কোথায় পাওয়া যাবে ? সঠিক মূল্যমান নির্ধারণ করতে অক্ষম হলে মানব জীবন যে অবস্থার সম্মুখীন হয় তা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসমূহের মানবতাবোধের মান থেকেই অনুভব করা যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ফলে মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য। তদুপরি ব্যক্তি স্বার্থ, দলীয় সুবিধাবাদ, গোত্রীয় লাভ ক্ষতি, বর্ণগত, দেশগত ও এলাকাগত সংকীর্ণতা বিশ্বমানবতাকে যে জটিল ব্যধিতে নিমজ্জিত করছে তা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই অনুভব করা সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে যে মহাশক্তির যোগান দিয়েছে তা একমাত্র স্বার্থপর মূল্যবোধের ফলেই মানবজাতির অকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং ধর্মের প্রভাবকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত মানবজাতির ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করে চলেছে।

চার ঃ ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের পরিণাম

শাসনশক্তি এমন এক হাতিয়ার যা দ্বারা জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের সুযোগও পেতে পারে, আবার চরমভাবে নির্যাতিতও হতে পারে। যেকোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকগণই রাষ্ট্রের সকল ধন-সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইন রচনা দ্বারা তারা নাগরিকদের সমগ্র জীবনের উপরই প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তাদের পরিচালিত বিচার পদ্ধতির উপরই সর্বসাধারণের মান ইজ্জত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ মন-মগজ গঠন করার চাবিকাঠিও তাদের হাতে ন্যস্ত। বিশেষভাবে আধুনিক যুগে নাগরিকদের গোটা জীবনের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, উন্নতি-অবনিত রাষ্ট্র পরিচালক ও শাসকবৃন্দের ইচ্ছা, মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভংগীর উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

এমতাবস্থায় শাসক সম্প্রদায় আল্লাহর দাসত্ব ও ধর্মের বন্ধন থেকে যদি মুক্ত হয়, বিশ্ব স্রষ্টার নিকট যদি জওয়াবদিহিতার অনুভূতি শূন্য হয় এবং

আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি যদি অবিশ্বাসী হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে চলবে। তাদের চরিত্র কিছুতেই নির্ভরযোগ্য হবে না। তারা নিজেদের পার্থিব লাভ-লোকসানের ভিত্তিতেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গদি রক্ষার জন্য তারা যেকোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত হবে। আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা শাসনযন্ত্রকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবে। তাদের গোটা চরিত্র মানুষের খিদমতের জন্য নিয়োজিত না হয়ে নিজেদের খিদমতেই নিযুক্ত হবে। শুধু গণবিপ্লব এড়াবার জন্য এবং জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত হবার ভয়েই তারা জনসেবা করবে। এখানেও চরম উদ্দেশ্য আপন স্বার্থ।

আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস যাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের শাসন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর শাসনে যে বিরাট পার্থক্য আছে তা যেমন যুক্তিসম্মত, তেমনি তা ঐতিহাসিক সত্য। যারা ধর্মকে বাস্তবজীবনে গ্রহণ করেছে তাদের শাসন ধর্মহীনদের শাসন থেকে স্বাভাবিকভাবেই আলাদা ধরনের হবে। এমনকি মুসলিম শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসেও ধার্মিক এবং অধার্মিক শাসকদের যুগে জনগণের জীবনে ব্যাপক পার্থক্য দেখা গেছে। শাসনশক্তিই সমাজের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সবল শক্তি। এ বিপুল শক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্ ও আখিরাতের ভয়, আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন এবং ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তদুপরি জনমতও আংশিকভাবে শাসনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের আচরণ একমাত্র জনমত দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ফলে তারা প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে এবং ক্ষমতার যাদুমন্ত্রে জনমতকে কলুষিত করে অনেক সময়ই অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দিতে পারে। তাই ধর্মনিরপেক্ষ শাসন জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় থাকার সাধনাই করে।

পাঁচ ঃ ধর্মীয় পরিণাম

মানব সমাজের সকল বিভাগ থেকে বেদখল করে যে সত্তাকে ধর্মীয় উপাসনালয়ে বন্দী করা হল তার পক্ষে নিজের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত বজায় রাখাও সম্ভব নয়। এরূপ দুর্বল কোন সত্তার প্রতি মানুষের অবহেলা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জীবনের অগণিত সমস্যায় জর্জরিত মানুষ যখন মুক্তির সন্ধানে সর্বক্ষণ অস্থির তখন তাকে বাস্তব কোন সমাধান না দেখিয়ে শুধু পরকালের ভয় দেখালে কি হবে ? যে 'ভগবান' আমাকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সংকুল অবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখায় না সে শুধু মন্দিরে বসে আমার নিকট পূজা দাবী করলে আমি তাকে ভালবাসব কেন ? যে 'গড' (God) সারা সপ্তাহে আমাকে সমস্যা সংকুল বিশ্বে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে নিশ্চিন্তে সুখনিদ্রা উপভোগ করে সে কোন্ অধিকারে শুধু রোববারে গীর্জায় আমার আনুগত্য

দাবী করে ? এরূপ নিষ্কর্মা স্বার্থপর ও অনাবশ্যক সত্তার অস্তিত্বই যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে কোন্ যুক্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

এমন কোন খোদাকে মানবার জন্য যারা মানুষকে আহ্বান জানায় তারাই বাস্তব ক্ষেত্রে খোদার স্থান দখল করে এবং অথর্ব ও বোবা খোদার পক্ষ থেকে ধর্মীয় সেবা হিসাবে নিজেরাই বিধান দান করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রের উপযোগী সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধান রচনা করার ক্ষমতা মানুষের নেই বলেই ঐসব ধর্মীয় নেতাদের রচিত অনুশাসন মানুষের প্রতি ইনসাফ করতে সক্ষম হয় না। ফলে রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের প্রতি ধর্মীয় সমর্থন যোগান দিয়ে বৃহত্তর মানব সমাজের উপর যুলুম করার উপায় হিসাবে খোদাকে ব্যবহার করা হয়। তখন এরূপ যালিম খোদাকে অস্বীকার করা ছাড়া মানুষের আর কোন পথই থাকে না।

ইউরোপে খৃস্টান ধর্মনেতাদের সমর্থনে যে জঘন্য পুঁজিবাদ জনসাধারণকে এক শ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে কার্লমার্কস যখন আওয়াজ তোলেন তখন গীর্জার সেই মানব সৃষ্ট ধর্মের দোহাই তুলেই এর প্রতিরোধ করা হয়। নির্যাতিত জনতাকে ধর্মের নামে আপন মুক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেখে কার্লমার্কস ঘোষণা করলেন যে, ধর্ম এক প্রকার আফিম—যা মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে ছাড়ে। তখন ধর্মীয় নেতারা ধর্মের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে তাদের ঐ দুর্বল খোদার দোহাই দিল। এবার মার্কস ঘোষণা করলেন যে, খোদাই মানুষের সেরা দুশমন।

কার্লমার্কসের মতবাদ মানব জীবনের জন্য সামগ্রিক বিধান দেয় না বলেই তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং একমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সমস্যাকে অধ্যয়ন করার ফলে তার রচিত সমাধান মানুষকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়নি। তিনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে মানুষকে মানুষের পূর্ণ দাস হওয়ার অকৃত্রিম পথই প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তিনি ধর্ম ও খোদার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তা খৃস্টান পাদ্রীদের কৃত্রিম ধর্মেরই প্রতিক্রিয়া। খোদাকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করে গীর্জায় আবদ্ধ করার পর তাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুলুমের সমর্থক হিসাবে পেশ করা ছাড়া জীবনে খোদার প্রয়োজনই বা কি থাকতে পারে ? তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বাস্তব ক্ষেত্রে নাস্তিকতার দিকে মানুষকে ধাবিত করে। নাস্তিকতা প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতারই স্বাভাবিক পরিণাম। ধর্মনিরপেক্ষতা খোদার প্রাথমিক পশ্চাদপসরণ, আর নাস্তিকতা তার চূড়ান্ত পরাজয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চরম অধর্মের পথ এবং ধর্মের চরম দুশমন।

ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের খোদা মানুষের স্বার্থের সৃষ্টি। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে যে ধারণা দেয় তা মানুষের মনগড়া রচনা নয়। কুরআনের আল্লাহ্ কোন উপাসনালয়ে বসে মানুষের নিকট পূজা দাবী করেন না। কারো সাথে আপোষ মীমাংসা করে নিজের অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে রাখবার মত দুর্বল মনোভাবও তাঁর নেই। তিনি নিজেকে একদিকে যেমন মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তা হিসাবে পেশ করেন, অপরদিকে তেমনি একমাত্র আইন ও জীবন বিধানদাতা হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করতে আদেশ করেন। দয়ালু ও মেহেরবান হওয়ার সংগে সংগে তিনি সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী বলেও দাবী করেন। তিনি মানুষের পূজা ও প্রশংসার কাংগাল নন। তেমনি সকলে তাঁর প্রেমে পাগল হলেও তাঁর কোন উপকার হয় না।

ইসলামের আল্লাহ্ তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার জন্য এমন এক পূর্ণাংগ ও ত্রুটিহীন জীবনব্যবস্থা বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন যার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করার কোন পথই অবশিষ্ট নেই। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনবিধান পরিবেশন করেছে তা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে আজও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। চৌদ্দশত বছরেও কুরআনের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। সর্বকালে ও সর্ব দেশেই এ কুরআন মানুষকে পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহর দেয়া বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীবনবিধি রচনা করা কোন কালেই সম্ভব নয় বলে কুরআন বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে।

যদি আরবী ভাষায় প্রেরিত কুরআন বিকৃত করা সম্ভব হতো তাহলে হয়তো ইসলামকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে রূপান্তরিত করা যেতো। অন্য ভাষায় কুরআনের তরজমা করে মূল কুরআনের সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব হলে হয়তো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারতো। কিন্তু কোন সফল অনুবাদকেই কুরআনের স্থলাভিষিক্ত করা অসম্ভব। একমাত্র আরবী ভাষায় প্রেরিত কুরআনকেই মুসলমানগণ কুরআন বলে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাসকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা কোথাও সফলতা লাভ করেনি। কুরআনের ভ্রান্ত অনুবাদ দ্বারা যতই মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ধাবিত করার চেষ্টা হউক না কেন, মূল কুরআন অক্ষত থাকার ফলে এর সঠিক অনুবাদও হতে থাকবে এবং সেই ভ্রান্তির প্রতিরোধও চলতে থাকবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

যতই ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করবে, কুরআন ততই দৃঢ়তার সাথে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবনবিধানের দাওয়াত দিতে থাকবে। সুতরাং ইসলামের সাথে এ মতবাদের লড়াই করার কোন যোগ্যতাই নেই।

ইসলামকে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করে মানুষের সমাজ জীবনকে কুরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার যে ব্যবস্থা কামাল পাশা করে গিয়েছেন তা ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামের সাথে যে অপকর্ম চলেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষতার পথ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিকৃত ইসলামের স্থানে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করে তিনি ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে আরবী ভাষা ও অক্ষরের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন এবং ইসলামকে খৃস্টধর্মের ন্যায় বাস্তব জীবন থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ২৫/৩০ বছর পর তুরস্কে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার যে নতুন ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা কামালের উক্ত পরিকল্পনার ব্যর্থতাই ঘোষণা করছে। এ জন্যই ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের বিজয় পথে ইসলাম এক অনতিক্রম্য বাধা হয়ে আছে। কুরআনকে বিনাশ করা সম্ভব নয় বলে ইসলামকেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে পরিণত করা অসম্ভব। কুরআন মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে এত স্পষ্ট বিধান দিয়েছে যে, মূল কুরআন অবিকৃত থাকা অবস্থায় যুক্তির জোরে সমাজ জীবন থেকে ইসলামকে উৎখাত করার সাধ্য কা'রো নেই। অবশ্য সামরিক শক্তি বলে সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব।

মুসলমান ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনার পর একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় নেই যে, ইসলামে বিশ্বাসী কোন মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী থাকা স্বাভাবিক নয়। মুসলমান নাস্তিক কথাটা যেমন হাস্যকর ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান কথাটাও তেমনি কৌতুকপ্রদ। তবু একজন অমুসলিম যে পরিমাণে ধর্মনিরপেক্ষ সে পরিমাণ ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও একজন মুসলিম নামধারী ব্যক্তি একমাত্র নামের জোরেই মুসলিম হিসাবে পরিচিত হয়। মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান বলে মুসলিম সমাজে এমন মুসলমানও পাওয়া যায়, যারা শুধু ধর্মনিরপেক্ষই নয়, আল্লাহ, রাসূল এবং আখিরাতেরও কোন পরওয়া করে না। তারা ব্যক্তি জীবনে ইসলামের বিধান মানা তো দূরের কথা, কুরআনকে তারা মধ্যযুগীয় মনে করে আধুনিক জগতে অনুসরণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলে বিশ্বাস করে। মুসলিম সমাজে এ ধরনের লোকের পক্ষে নেতা হওয়াও যেখানে সম্ভব, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তথাকথিত মুসলমানদের পক্ষে সমাজে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব অর্জন করাও কঠিন নয়।

কিন্তু কোন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী পণ্ডিত কি কুরআন ও রাসূলের জীবন থেকে তার মতবাদের সপক্ষে কোন একটি দলিলও পেশ করতে সক্ষম হবেন? এ ধরনের লোকদের পক্ষে দু'টো পথের যে কোন একটিকে বাছাই করে নেয়া উচিত। কুরআন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, "তোমরা পরিপূর্ণ ইসলামে দাখিল হও।" যারা মুসলমান থাকতে চায়, তাদের পক্ষে হুকুমের অনুসারী হয়ে আন্তরিকতার সাথে ইসলামী জীবনবিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করাই একমাত্র সম্মানজনক পন্থা এবং সততার পরিচায়ক। কিন্তু ইসলাম কারো অপসন্দ হলে কুরআন তাকে মুসলমান হওয়ার জন্য যেমন বাধ্য করে না, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামকে জীবনে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেও নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দেবার অধিকারও দেয় না। যে ব্যক্তি কুরআনের সাথে এরূপ অসদ্ব্যবহার করতে সক্ষম তার জীবনের কোন দিকেই সততার আশা করা যায় না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের প্রকারভেদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এক শ্রেণীকে ধূর্ত ও চালাক বলা চলে এবং আর এক শ্রেণীর উপযুক্ত পরিচয় দিতে গেলে 'বেওকুফ' বলাই সমীচীন। ধূর্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে প্রচার করে বটে, কিন্তু তাদের অনেকেরই ব্যক্তি জীবনে ধর্মের কোন গন্ধও পাওয়া যায় না। তারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে করে, কিন্তু সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক সুবিধা ও অন্যান্য পার্থিব প্রয়োজনের তাকিদে ধর্মকে মৌখিক স্বীকৃতি দান করে মাত্র।

বেওকুফ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নিতান্তই করুণার পাত্র। তারা নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, যিকর ইত্যাদি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আদায় করে, কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানকে মেনে চলার কোন তাকিদই অনুভব করে না।

আল্লাহর কিতাবকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করে যারা শুধু ইসলামের কতিপয় অনুষ্ঠান নিয়েই সন্তুষ্ট, তাদের প্রতি কুরআন যে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে, তা যে কোন সত্যিকার মুসলমানের অন্তরকেই কাঁপিয়ে তুলবার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেন, "তোমরা কি কিতাবের কতক অংশের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছ এবং আর কতক অংশকে অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে তাদের জন্য এ দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কি বদলাই বা থাকতে পারে। অতপর পরকালে তাদেরকে ভয়ংকর শাস্তির দিকে ঠেলে দেয়া হবে।"

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- আল কুরআনের সহজ অনুবাদ
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- ইকামাতে দ্বীন
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- The Establishment of Deen Islam
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- JAMA'AT-E-ISLAMI IDEOLOGY MOVMENT
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- নবী জীবনের আদর্শ
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- আদম সৃষ্টির হাকীকত
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন প্রতিকারই বা কি?
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের চার দফা কর্মসূচী
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- কুরআন বুঝা সহজ
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- আল্লাহর দুয়ারে ধরণা
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
- গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী